কারবালা ও ইয়াজিদ

(অজানা ইতিহাসের তত্ত্বতালাশ)

উম্মে আমিরাহ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

মক্কা থেকে কারবালার পথ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার; যিনি পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু; যিনি আসমান, জমিনের এবং এর মধ্যবর্তী সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অপ্রতিরোধ্য। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

যুগ যুগ ধরে ইসলামবিদ্বেষী ও বিরোধীদের দ্বারা ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি এবং ইসলামের ভাবমূর্তির বিকৃতি নতুন কিছু নয়। বিশেষত, ইতিহাসের যে অংশের সাথে আমাদের নির্মল অনুভূতির সম্পর্ক থাকে, সেসব ক্ষেত্রে তো এমন ষড়যন্ত্রের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তাদের কাছে এমনই এক আবেদনময় ঘটনা হলো কারবালা প্রান্তরে হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত।

ইসলামের ইতিহাসে এটি এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। একই সাথে আরও বড়ো ট্র্যাজেডি ছিল, এই ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনার মাধ্যমে জাল হাদিস এবং বয়ানের অবতারণা। যার ফলে কলঙ্কিত হয়েছে হাসানাইনের[১] অসাধারণ ভাবমূর্তি। একদিকে রাফেজিরা[২] আহলে বাইত[৩] নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যদিকে আবার নাসিবিরা[৪] এই বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করেছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বরাবরের মতোই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে।

অপরদিকে কারবালার ঘটনা নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত ভ্রান্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম না। কারবালার ঘটনার সাথে এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় ঘটেছে *বিষাদসিন্ধু*-এর মতো কল্পিত বানোয়াট বই কিংবা মুহাররমে শিয়াদের তাজিয়া মিছিলের মাধ্যমে। এসব সূত্র থেকে তাদের সামনে ফুটে ওঠে বিকৃত ইতিহাসের একটি ভ্রান্ত রূপ। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রতিবছর আশুরার সময় ঘনিয়ে এলে কিছু জাতীয় পত্রিকাতেও তুলে ধরা হয় একই ধরনের ভুলে ভরা অতিরঞ্জিত কথা।

বস্তুনিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্যতা ও ইলমের পোশাকের আড়ালে নানান সময়ে ফেরি করা হয়েছে বানোয়াট বর্ণনা এবং বিকৃত ইতিহাস। ফলে প্রকৃত ঘটনার সত্যতা জানতে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অবস্থান জানতে সতর্কভাবে যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। কিন্তু আফসোসের বিষয়—বাংলা ভাষায় কারবালার ইতিহাসভিত্তিক তথ্যবহুল বই নিতান্তই কম, হাতে গোনা কয়েকটা; যার বেশির ভাগেই আবেগের বশে প্রান্তিকতার দিকে ঝুঁকে যাওয়া হয়েছে।

---

[১] হাসান ও হুসাইন (রা.) উভয়কে একত্রে হাসানাইন বলা হয়।

[২] যারা আলি ও ফাতিমা (রা.) এবং হাসানাইনের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় ইসলামের প্রথম তিনজন খলিফার খিলাফত অস্বীকার করে এবং তাঁদেরকে জোরপূর্বক খিলাফত দখলকারী মনে করে গালিগালাজ করে।

[৩] আহলে বাইত বলতে নবিপরিবার বোঝানো হয়, যাদের জন্য সাদাকা গ্রহণ হারাম। তবে শিয়ারা কেবল আলি ও ফাতিমা (রা.) এবং তাঁদের বংশধরদের আহলে বাইত মনে করে।

[৪] যারা রাফেজিদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব রাখে।

মুসলিম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে এমন ভ্রান্তির প্রচলন নিঃসন্দেহে মারাত্মক। এর ফলে যেমন রাফেজিদের[৫] নিপুণ মিথ্যাচারের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তেমনই আশঙ্কা থাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী হিসেবে নিজেদের ইতিহাস ও আত্মপরিচয় নিয়ে সংশয়ে পড়ার। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান হিসেবে নিজেদের পূর্বসূরিদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং নিজেদের বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য উক্ত সময়কালের ইতিহাস অধ্যয়ন আবশ্যক।

আগ্রহীদের জন্য কারবালার প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ যে নেই, তা কিন্তু নয়। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি, ইতিহাসবিদদের তথ্যভিত্তিক আলোচনা, আলিমদের ওয়াজ-দারস ইত্যাদির মাধ্যমে—একজন মুসলমান আত্মপরিচয় বহনকারী—নিজেই কারবালার প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করতে পারবেন। তবে এই কাজের আঞ্জাম দিতে প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া আওয়াম বা সাধারণ জনগণের জন্য সহজ ও সংক্ষেপে কারবালার ঘটনা নিয়ে বাংলা ভাষায় দলিল নির্ভর লেখাজোখা খুঁজে পাঠ করা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কঠিনই বটে।

দীর্ঘ সময় ধরেই এমন একটি বইয়ের অভাববোধ করতাম, যেখানে হাসানাইন, মুয়াবিয়া (রা.) ও ইয়াজিদের শাসনামল সম্পর্কিত ইতিহাস সংক্ষেপে একত্রিত করে প্রয়োজন অনুপাতে বিশ্লেষণ করা হবে। একই সাথে তাঁদের ওপর আরোপিত অভিযোগের খণ্ডন বা সত্যতার প্রমাণে সালাফদের বক্তব্য পেশ করা হবে। তবে কালের বিবর্তনে যে একসময় এই নাচিজকে এমন তাওফিক আল্লাহ দেবেন, তা ছিল সত্যিই অভাবনীয়।

ইতিহাসের এই অংশের আলোচনা এতই স্পর্শকাতর যে, প্রতিটি ঘটনাই আলাদাভাবে বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে। তবে এখানে মূলত আলোচনা করা হবে ইয়াজিদ ও কারবালার ঘটনা। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হবে, আর তা কেবলই প্রেক্ষাপট বোঝার স্বার্থে—সংক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও প্রতিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বুঝতে পাঠকের গভীর মনোযোগের প্রয়োজন।

হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা আরেকটু পেছনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানব। জেনে নেব আলি (রা.)-এর শাহাদাতপরবর্তী খিলাফতের দ্বন্দ্ব নিয়ে। যে ফিতনা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। সংক্ষেপে আরও জেনে নেব মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামল সম্পর্কে। এরপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইয়াজিদের মনোনয়ন ও শাসনকাল নিয়ে। অতঃপর কারবালার ঘটনার প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যেকটা সূত্রকে বিশ্লেষণ করা হবে। পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করা হবে বহুল প্রচলিত বর্ণনাগুলোর অসংগতি এবং আশুরার সাওম ও এর ফজিলত।

বইটিতে তৎকালীন সময়ের পরিষ্কার একটি দৃশ্যপ্রবাহ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে; যেন পাঠক জানতে পারেন, আদতেই সেই সময়ে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছিল। আর প্রচলিত বানোয়াট ঘটনাবলি পড়ার কারণে ওই সময়কার ইতিহাস পাঠে যে অসংগতি ছিল, তা যেন দূর হয়, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বইটিকে কারবালা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক

---

[৫] যারা আলি, ফাতিমা (রা.) ও হাসানাইনের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় ইসলামের প্রথম তিনজন খলিফার খিলাফত অস্বীকার করে এবং তাঁদের জোরপূর্বক খিলাফত দখলকারী মনে করে গালিগালাজ করে।

বিষয়সমূহ নিয়ে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং বর্তমান সময়ের ইতিহাসবিদদের গবেষণা হতে গৃহীত তথ্যাদির সমন্বিতরূপ বললেই অধিক যুক্তিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে বরং আমার ভূমিকা ছিল একজন সংকলনকারী লেখক হিসেবে।

ইতিহাসের আলোচনা গ্রহণের ক্ষেত্রে *তারিখু খলিফা ইবনি খইয়্যাত, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখুত তাবারি, তারিখে ইসলাম*-এর মতো মৌলিক কিতাবগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি। পাশাপাশি সেসব ঘটনার বিশ্লেষণ নিয়েছি মাওলানা ইসমাইল রেহান, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, মাহমুদ শাকের এবং ড. রাগিব সারজানি প্রমুখের মতো বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ থেকে।

বিশেষত ইয়াজিদকে লানত দেওয়া, তার কাফির বা ফাসিক হওয়া বিষয়ক আলোচনাকে উদ্ধৃত করেছি ইমাম ইবনুল জাওজির *আর-রদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন জাম্মি ইয়াজিদ* থেকে। এই অংশে সহিহ বুখারির একটি হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়েছি উক্ত কিতাবের বাংলা অনুবাদে ড. মুহাম্মাদ আবদুর রশিদ ও আবদুল্লাহ জুবায়ের লিখিত পর্যালোচনা হতে।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ছিল ধারণাতীত কঠিন। কেননা, এখানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ, একদিকে আহলে বাইতের মর্যাদা এবং অপরদিকে সাহাবিদের প্রতি ইনসাফ। তাই অনির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ফিতনায় মোড়ানো এই সময় সম্পর্কে অধ্যয়ন ও আলোচনা করা খুবই বিপজ্জনক। কোনো ভুল মন্তব্য করার অর্থ হলো—আহলে বাইত বা জান্নাতি কোনো সাহাবির প্রতি অন্যায় করা।

আমরা আহলে বাইত এবং সাহাবিগণ উভয়কেই ভালোবাসি। আমরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে তাঁদের বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি, তাঁরা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা সেই প্রজন্ম, যাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সন্তুষ্ট। তাই তাঁদের কোনো একজনের ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা অবশ্যই মারাত্মক গুনাহ।

আমি আশা রাখি, সহজে ও সংক্ষেপে কারবালার সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বইটি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির কাজে বিভিন্নভাবে যারা যুক্ত ছিলেন এবং সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি সম্মানিত প্রকাশকের প্রতি।

সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি নির্ভরযোগ্য উৎস হতে বর্ণনাগুলো গ্রহণ করার, তবুও ভুল থেকে যাওয়া মানবীয় ত্রুটির ঊর্ধ্বে না। এজন্য কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা অবশ্যই সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ রইল পাঠকদের প্রতি।

পরিশেষে এই বইয়ের কবুলিয়াতের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী। তিনিই যখন তাঁর বান্দাকে লেখার তাওফিক দিয়েছেন, তখন তিনিই যেন এই সামান্য পরিশ্রমকে কবুল করে নেন। যদি কোনো ভুলত্রুটি বা বেয়াদবি প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে তিনিই যেন নিজের অসীম দয়ায় ক্ষমা করে দেন। আমাদের সকলকে ঈমান, আমল, আখলাকের দিক থেকে উত্তম বানিয়ে দিন এবং আমাদের রিজিক ও হায়াতে বারাকাহ দিন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

উম্মে আমিরাহ
রাজশাহী, বাংলাদেশ
২৯ রমাদান, ১৪৪৪ হিজরি

সূচিপত্র

খোলাফায়ে রাশেদা	১৫
খিলাফত হস্তান্তর	২৯
মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত	৩৯
ইয়াজিদের মনোনয়ন	৪৫
ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত	৫৩
ইয়াজিদের শাসনামল	৬১
সীমালঙ্ঘনের সূচনা	৭০
কুফার পথে যাত্রা	৭৬
উদ্দেশ্য কি বিদ্রোহ	৮২
কুফায় পরিস্থিতির পরিবর্তন	৮৮
কারবালার ময়দানে	৯৪
কাফেলার পরিণতি	১০২
প্রকৃত হত্যাকারী কে	১০৭
ওয়াকিয়া আল হাররা	১১৫
ইয়াজিদ কি কাফির	১২৩
রাফেজি-নাসেবি দ্বন্দ্ব	১৪৭
তাজিয়া মিছিল ও মাতম	১৫৬
আশুরা ও কারবালা	১৬২
প্রচলিত ভ্রান্তি নিরসন	১৭০

খোলাফায়ে রাশেদা

উত্তরে রোমান ও পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের মতো পরাশক্তি; দক্ষিণে ইয়েমেন— আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরঘেরা জনপদ জাজিরাতুল আরব। বিশ্বরাজনীতিতে অনেকটাই প্রভাব ও গুরুত্বহীন এই ভূখণ্ডে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে নতুন আদর্শের পাতাকাবাহী একটি রাষ্ট্র। ইসলাম যার মূল আদর্শ। এর নৈতিক ও সামরিকপ্রধান স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা.)। নবম হিজরিতে সীমান্তবর্তী তাবুক নামক স্থানে রোমানদের সাথে এক বিশাল সামরিক মহড়া প্রদর্শিত হয়। এই মহড়ায় যুদ্ধ ছাড়াই ভয়ে পিছু হটে রোমান বাহিনী। আরবের বাইরে মুসলিমদের বিজয়যাত্রা এখানেই শুরু। দ্রুতই এই বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত।

কয়েক মাসের ব্যবধানেই পারস্য ও ইয়েমেনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন নবিজি। কিন্তু ফলাফল আসার আগেই দুনিয়ার সফর শেষ করেন তিনি। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহান যখন শোকে কাতর; আহলে বাইত ব্যস্ত তাঁর গোসল ও দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণে, তখন আবু বকর (রা.) একটি খবর পেলেন। মদিনার আনসার সাহাবিদের বেশ কয়েকজন নেতা একটি বৈঠকে বসেছেন মুসলমানদের পরবর্তী নেতা নির্ধারণের জন্য। তাদের ভাবনা— আনসারগণ যেহেতু মদিনার স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাঁরাই রাসূল (সা.)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, সুতরাং নবিজির অবর্তমানে মুসলমানদের পরবর্তী নেতা হবেন আনসার সাহাবিদের মধ্য থেকে।

এই খবর পেয়ে আবু বকর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে আনসারদের সেই বৈঠকে হাজির হলেন। তিনি বৈঠকে উপস্থিত আনসার সাহাবিদের অনুরোধ করলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করার জন্য। বললেন, উম্মাহর ঐক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভাজন ভুলে মুসলমানদের সমগ্র উম্মাহর জন্য কেবল একজন নেতা নির্ধারণ করতে হবে। তিনি আনসারদের প্রশংসা করে সবার উদ্দেশ্যে বললেন—‘জেনে রেখো! কুরাইশরাই খিলাফতের হকদার। বংশমর্যাদা ও মাতৃভূমি উভয় দিক দিয়েই তারা সমগ্র আরববাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কুরাইশ ব্যতীত অন্য কেউ মুসলিমদের প্রধান হলে আরবের কোনো গোত্রই তা মেনে নেবে না। ফলে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।’ এই কথা বলে তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন শীর্ষ সাহাবি উমর ও আবু উবায়দা (রা.)-কে দেখিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করার আহ্বান জানালেন।

উমর (রা.) এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। আবু বকর (রা.) থাকতে তিনি কীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? এটা তো ভাবাই যায় না। তিনি আবু বকর (রা.)-এর হাতটি ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে বলেন—‘যেহেতু মুহাম্মাদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, তাই আবু বকর একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উম্মাহকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।’ ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি সেখানেই আবু বকর (রা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ নেন।

মুহূর্তেই গোটা বৈঠকের পরিবেশ পালটে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, উত্তরাধিকারী হওয়ার বিবেচনায় আবু বকর (রা.)-এর কথা কেউ চিন্তাই করতে পারল না। কারণ, আবু বকর (রা.)

ছিলেন একজন কোমল আচরণের হৃদয়বান ব্যক্তি; যিনি তাঁর গোটা জীবনের পরতে পরতে জ্ঞান, সাহস ও দরদের প্রদর্শন করেছেন। একপর্যায়ে গোটা বৈঠক সর্বসম্মতভাবে আবু বকর (রা.)-কে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে রাসূল (সা.)-এর খলিফা হিসেবে সম্বোধন করেন।

আবু বকর (রা.) উত্তরাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগপর্যন্ত এই খলিফা উপাধিটি গোটা বিশ্বজাহানে আর কোথাও দেখা যায়নি। কোনো সম্প্রদায় তাদের নেতাকে খলিফা হিসেবে অভিহিত করেনি। কেউ জানতও না, এই উপাধির মানে কী, বা এই পদবি কতটা শক্তি ধারণ করে। প্রথম খলিফাকে দায়িত্ব নিয়েই এসব মৌলিক প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়েছিল।

রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মুসলিম জাহানের প্রধান হওয়ার পর আবু বকর (রা.) সাহসিকতার সাথে রাসূলের অসমাপ্ত অভিযানগুলো অব্যাহত রাখেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে পারস্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনি পরাশক্তি পারস্যের দখল থেকে ইরাক বিজয় করেন। এরপর নজর দেন রোমান শাসনাধীন সিরিয়ার দিকে। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে এক করে সম্মিলিত বাহিনীর সিরিয়া অভিযান পরিচালনা করেন। নেতৃত্ব তুলে দেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর হাতে। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দুনিয়ার সফর শেষ করেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)।

অন্তিম অসুস্থতাকালে তিনি মজলিসে শুরার জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের অনুরোধ করেন তাঁর জীবদ্দশাতেই পরামর্শপূর্বক পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য। এই ব্যাপারে প্রথম অনাগ্রহ প্রকাশ করেন উমর (রা.)। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে বলেন, পরামর্শ করে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা মনোনীত করতে এবং সিদ্ধান্ত যা হয় উমর (রা.)-কে জানাতে। উমর (রা.)-এর এমন অনাগ্রহে সকলেই খলিফা আবু বকর (রা.)-এর শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন খলিফা হিসেবে একজনকে মনোনীত করতে।

মজলিসে শুরার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফাতুল মুসলিমিন পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)-সহ সকল জ্যেষ্ঠ সাহাবিগন বিনা বাক্যে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। উমর (রা.)-এর কঠোর মনোভাবের দিকে ইঙ্গিত করে দুয়েকজন অবশ্য আপত্তি তোলেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, খলিফা হলে উমর (রা.)-এর কঠোরনীতি জনগণের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে। আবু বকর (রা.) তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন—'উমরের কঠোর মনোভাবের কারণ হলো, সে আমাকে নরম অবস্থায় পেয়েছে। তাই শাসন পরিচালনায় ভারসাম্য তৈরির জন্যই সে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। দায়িত্বের ভার অর্পিত হলে তাঁর মাঝে এমনিতেই দয়ানুভব তৈরি হবে।'

আবু বকর (রা.)-এর ব্যাখ্যায় সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল নতুন খলিফা হিসেবে উমর (রা.)-এর মনোনয়নের খবর। লোকমুখে শুনে আবু বকর (রা.)-এর নিকট এসে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণে নিজের আপত্তির কথা জানালেন উমর (রা.)। আবু বকর (রা.) তাঁকে মিষ্টি ধমক দিয়ে বললেন—'আল্লাহর কসম! যদি জানতাম তুমি এই পদের জন্য লোভী,

তাহলে কখনো তোমাকে মনোনীত করতাম না। আর জেনে রাখো, তোমাকে রাজি করাতে যদি তরবারি ব্যবহার করতে হয়, তবে তা-ই করব।' অতঃপর তাঁর সামনে মুসলিম জাতির সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা, দাওয়াতি মিশন ও বিজয়াভিযান পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্বের অনিবার্যতার বিষয়টি তুলে ধরলেন। অবশেষে সম্মতি প্রকাশ করলেন উমর (রা.)।

এক অনাড়ম্বর মজলিসে উমর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এক এক করে সকল সাহাবি। দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর (রা.)-এর চারিত্রিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। দয়া-অনুগ্রহে অনন্য হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিচার বিভাগ, পুলিশ, রাজস্ব, সেনাবাহিনী-প্রশাসন ও সরকারি ব্যস্থাপনায় অভাবনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ঘটে তাঁর শাসনামলে। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে ইসলামের সীমানা ছড়িয়ে পড়ে পূর্বে আর্মেনিয়া থেকে পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত। প্রায় অর্ধ পৃথিবী চলে আসে ইসলামি শাসনের অধীনে। বিশ্বজুড়ে যখন মুসলিমদের জয়জয়কার, তখন এক অভিশপ্ত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে শহিদ হন আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক (রা.)। শাহাদাতের পূর্বে তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট শুরা বা বোর্ড গঠন করেন। তাঁদের নির্দেশ দেন, জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পরামর্শপূর্বক অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করতে। তবে কোনোভাবেই যেন স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে বেছে না নেয়—এই ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর জ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ সাহাবিদের দ্বারা গঠিত শুরা তথা পরামর্শের ভিত্তিতে দুজনের নাম খলিফার জন্য চূড়ান্ত করে। দুজনেই রাসূল (সা.)-এর মেয়ের জামাই এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি; একজন উসমান ইবনে আফফান (রা.), অন্যজন আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)। সাহাবিদের কেউ কেউ খলিফা হিসেবে আলি (রা.)-কে পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ উসমান (রা.)-এর পক্ষে রায় দেন।

এমতাবস্থায় শুরার প্রধান কর্ণধার আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী খলিফা হিসেবে চূড়ান্ত করেন উসমান (রা.)-কে। এই রায় সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। শপথ গ্রহণের পূর্বে ৬৮ বছর বয়সি উসমান (রা.) অঙ্গীকার করেন, তিনি খিলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ এবং পূর্বসূরি দুই খলিফার দৃষ্টান্ত সামনে রাখবেন।

উসমান ইবনে আফফান (রা.) ছিলেন দয়া-অনুকম্পা ও লজ্জাশীলতায় অতুলনীয়। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি উমর (রা.)-এর অসমাপ্ত কাজকে বেগবান করেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে ইসলামের ঝান্ডা পৌঁছে যায় সুদূর আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত। এখানে লক্ষণীয় হলো, উসমান (রা.) এমন একসময় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যখন ইসলামি সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় অর্ধ পৃথিবীজুড়ে। এই বিশাল ভূখণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ও জনস্বার্থ রক্ষার পুরো দায়িত্বভার এখন তাঁর ওপর। রাসূল (সা.) এবং পূর্বের দুই অনুসারীর মতো এখনকার বাস্তবতা শুধু দাওয়াতি কাজ, আত্মরক্ষা, আক্রমণের কৌশল নির্ধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়, দরবার ও আদালত পরিচালনা, ব্রিজ-সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, বেতন নির্ধারণ ও পরিশোধের মতো জীবনঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডগুলোকেও তত্ত্বাবধান করতে হয়। ফলে তাঁকে পূর্ববর্তী খলিফাদের তুলনায় হতে হয় অনেক বেশি তৎপর।

উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথমার্ধ ব্যয় করেন কুরআনুল কারিমের একটি গ্রহণযোগ্য সংস্করণ তৈরির প্রচেষ্টায়। তিনি কুরআনের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল সেই সময়ে প্রচলিত কুরআনের সকল সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে এর অসংগতিগুলো নির্ণয় এবং সেসবকে পর্যালোচনা করে বিতর্কের ঊর্ধ্বে মুসহাফে আবু বকরের আলোকে সন্নিবেশ করা। পরিশেষে উসমান (রা.)-এর ঐকান্তিক ভূমিকায় একটি অভিন্ন কুরআনের সংকলন সম্পন্ন হয়। এই সংস্করণের বাইরে আরও যা সংস্করণ পাওয়া যেত, সেগুলোকে বিনাশ করা হয়। এরপর থেকেই কুরআনের সকল সংস্করণে শব্দ-বাক্য বিন্যাস অভিন্ন হয়, যা আজও বিদ্যমান।

এই বিশাল স্পর্শকাতর কাজটি সুসম্পন্ন করায় অন্তরে রোগগ্রস্ত কতক মুসলিম তাঁর কুরআন সংকলনের কারণ ও হেতু নিয়ে নানা সংশয়ের অবতারণা করে।

কুরআন সংকলনের পর তিনি অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতের মতো একটি বড়ো কাজের দিকে মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সময়ে মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বলতে তেমন কিছু ছিল না। মদিনায় তখন নানা খাত থেকে যে অর্থ আসত, তা তাৎক্ষণিকভাবেই মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। আবু বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতে মোটামুটি একই ধারা অব্যাহত ছিল। যদিও আবু বকর (রা.)-এর সময়েই প্রথম রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রচলন করা হয়। উমর (রা.)-এর সময়ে এসে সেই রাজকোষ অর্থে ভরে যায়। তাঁর সময়েই ইসলামের একটি নির্দিষ্ট সেনাবাহিনী গঠন করা হয় বিধায় সেই বর্ধিত অর্থ তিনি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। উসমান (রা.)-এর সময়ে এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা সরকারের অন্যতম একটি প্রধান কাজে পরিণত হয়। কারণ, এই কোষাগারের অর্থ দিয়েই রাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো।

তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। বিশেষ করে অনেক দূরে থাকা প্রদেশগুলো তাঁর সময় থেকেই খাজনা দেওয়া শুরু করে। এমন পেক্ষাপটে মিশরের তৎকালীন গভর্নর ও আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবি আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরের গভর্নর হিসেবে প্রত্যাশামতো খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হন। ফলে উসমান (রা.) তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে আপন দুধভাই আবদুল্লাহকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ অবশ্য কর আদায়ে বিরাট সাফল্য বয়ে আনেন এবং আমর (রা.)-এর তুলনায় দ্বিগুণ খাজনা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। এর মাধ্যমেই তাঁকে পদায়নের ব্যাপারে উসমান (রা.)-এর বিবেচনাবোধের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এদিকে আমর ইবনুল আস (রা.) অভিযোগ করেন, বাড়তি চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় মিশরের জনগণের জন্য জুলুম হয়ে যাবে। ফলে সেখানে অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের জনস্বার্থ ও নিরাপত্তা সঠিকভাবে নিশ্চিতের জন্য উসমান (রা.) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর কাছের ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন, যেন তাদের কর্মকাণ্ড নিরবচ্ছিভাবে তদারকি করা যায়। তিনি এই মানুষগুলোকে ভালোমতো চিনতেন বিধায় তাদের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলেন।

উসমান (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া (রা.)। এর আগে দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে দামেশক এবং এর আশেপাশের এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উসমান (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর মুয়াবিয়া (রা.)-এর এলাকাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তাই ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় থাকা কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ পুরো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার কর্তৃত্ব মুয়াবিয়া (রা.)-এর অধীনে আসে।

জাহেলি যুগে মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন মক্কায় কুরাইশদের অন্যতম শীর্ষ নেতা, যিনি তিনটি বড়ো যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাবা ছিলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এবং মা হিন্দা। তিনিও তার স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন। এই হিন্দা উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচা হামজার মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত করেছিল। নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল—কোনো ব্যক্তি অতীতে যত অপরাধই করুক না কেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার ওপর প্রতিশোধ নিতেন না। তাই মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানের পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সা.) তাঁদের ক্ষমা করে দেন। রাসূল (সা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে খুবই যোগ্য মনে করতেন। তাই ইসলাম গ্রহণের পর সব সময় তাঁকে নিজের কাছাকাছি রাখতেন। ওহি লেখার গুরুদায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) সিরিয়া বিজয়ের পর মুয়াবিয়া (রা.)-কে দামেশকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। গভর্নর হওয়ার পর থেকেই মুয়াবিয়া (রা.) নিজ যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে একটি সাহসী সেনাবাহিনী তৈরি করেন, যা ব্যক্তি মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুগত ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই পরবর্তী সময়ে উসমান (রা.)-এর অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে বিরাট এক ঐতিহাসিক সংকটের সৃষ্টি করে।

উসমান (রা.)-এর ১২ বছরের খিলাফতের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের অসন্তোষ ও ক্ষোভের দেখা দেয়। মিশরে তাঁর দুধভাই অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য সেখানকার জনগণের ওপর এতটাই চাপ দেয় যে, তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ফলে সেখানে দাঙ্গা দেখা দেয়। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, এই উসকানি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। তৎকালীন মিশরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খলিফার হস্তক্ষেপ কামনা করে। মিশরের গভর্নরকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। কিন্তু এই আবেদনে সাড়া পেতে বিলম্ব হওয়ায় খলিফার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার জন্য মদিনায় একটি দল আসে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয় প্রতিনিধিদল হিসেবে। ঠিক একই সময়ে উত্তরের দিক থেকেও আরেকটি দল খলিফার কাছে রওনা হয়। তাদেরও স্থানীয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযোগ। অর্থাৎ বোঝা যায়, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই খলিফা উসমান (রা.)-এর নিয়োগকৃত প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

এসব আবেদন ও দরখাস্ত পেয়ে উসমান (রা.) বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েন। তিনি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আলি (রা.)-এর শরণাপন্ন হন। তাঁকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি প্রতিনিধিদলের অসন্তোষ কমাতে ভূমিকা পালন করেন। তাদের শান্ত করেন এবং বুঝিয়ে নিজ এলাকায় ফেরত পাঠান। আলি (রা.) খলিফার প্রত্যাশা অনুযায়ী খলিফার পাশে দাঁড়ান। তিনি উসমান (রা.)-কে জনগণের বৈধ সংকটগুলো শুনে তা সমাধান করার পরামর্শ দেন।

এরপর উসমান (রা.) মিশর থেকে আগত সেই প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের মিশরের গভর্নর তথা নিজের দুধভাইকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেন। মিশরের সেই প্রতিনিধিদলকে দায়িত্ব দেন, যেন তারা দেশে ফিরে গিয়ে গভর্নরকে জানায়, খুব শীঘ্রই তার জায়গায় নতুন একজন গভর্নর দায়িত্ব নিতে আসছেন।

খলিফার এসব কথা শুনে মিশরীয়রা আশ্বস্ত হন এবং সন্তুষ্টচিত্তে মিশরে রওনা দেন। কিন্তু পথমধ্যে খলিফা উসমানের একজন দাসের সাথে তাদের দেখা হয় এবং তার নিকট তারা একটি চিঠি পায়, যেখানে তাদের ধারণামতে খলিফার স্বাক্ষরও ছিল। চিঠিটি পাঠানো হচ্ছিল মিশরের গভর্নরের কাছে। এই চিঠিতে গভর্নর আবদুল্লাহকে আদেশ দেওয়া হয়, যেন খলিফার কাছে নালিশ করা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের গ্রেফতার করে দ্রুত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অসন্তোষের ব্যাপারটি আরও ছড়িয়ে পড়ার আগে তাদের সমূলে দমন ও উৎখাত করার আদেশও দেওয়া হয় সেই চিঠিতে।

চিঠিটি হাতে পেয়েই মিশরের সেই প্রতিনিধিদল তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। তাদের সাথে যোগ দেয় কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও। তাদের আসার খবর পেয়ে উসমান (রা.)-ও জলদি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। জানতে চান—কী হলো যে তারা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো? মিশরের প্রতিনিধিদল তাঁকে সেই উদ্ধার করা চিঠি দেখালে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন। তিনি কসম কেটে বলেন, এই ধরনের কোনো চিঠি তিনি লেখেননি।

অনেকে ধারণা করে, চিঠিটি লিখেছিল উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই মারওয়ান; যিনি দামেশকের গভর্নরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই চিঠিটি লিখে সেখানে উসমান (রা.)-এর জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন।

এবার আর সেই দরখাস্তকারীদের শান্ত রাখা গেল না। তারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। প্রথমে তারা চিঠি জালকারী ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলল, যিনি ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.)-এর ভাই। খলিফা উসমান (রা.) তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর তারা খলিফা উসমান (রা.)-কে পদ ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে। খলিফা সেটা করতেও অস্বীকার করেন। তিনি জানান, তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল আল্লাহর কাছে। এখন তিনি যদি বেপরোয়া কোনো শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে পদ ছেড়ে দেন, তাহলে আল্লাহর নিয়ামতের সাথে উপহাস করা হবে।

এই বলে তিনি মোটামুটি অন্য সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজ ঘরে চলে যান এবং কুপির আলো জ্বালিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। উল্লেখ্য, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কিংবা মানসিক অস্থিরতার সময় উসমান (রা.) কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়ার বা অন্তরে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতেন।

অন্যদিকে উসমান (রা.)-এর বাসার বাইরে দাঙ্গাকারীদের ক্ষোভ, উত্তেজনা ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ক্রমেই বাড়তে থাকে। তখন চলছিল হজের মৌসুম। মদিনার অধিকাংশ সাহাবি হজ পালনের জন্য মক্কায় ছিলেন। ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে আলি (রা.) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন উসমান (রা.)-এর ঘর পাহারা

দিতে। পাহারায় আরও কিছু সাহাবি যুক্ত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁদের পরাস্ত করে পাশের বাড়ির দেওয়াল টপকে উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা খলিফাকে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পায় এবং নিজেরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর ওপর হামলে পড়ে এবং নির্মমভাবে তাঁকে শহিদ করে।

রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে লজ্জাশীল সাহাবি ইসলামের তৃতীয় খলিফার এমন অকস্মাৎ মর্মান্তিক শাহাদাতে হতভম্ভ হয়ে যায় গোটা মুসলিম বিশ্ব। মদিনার প্রতিটি মহল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চার দিন ধরে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে বিদ্রোহীরা। মদিনাবাসীরা ক্ষণ গুনতে থাকে, কখন কেটে যাবে এই অস্থির সময়। একসময় ধ্বংসযজ্ঞ কমে আসে; কিন্তু তখন বিদ্রোহী দলের নেতারা শর্ত আরোপ করে বসেন—তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না তাদের আস্থাভাজন কোনো ব্যক্তি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

অধিকাংশ সাহাবি আলি (রা.)-কে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন। প্রথমে আলি (রা.) সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন; কিন্তু অবস্থা এমন বিরাজ করছিল, তিনি ছাড়া দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতর আর কেউই ছিলেন না। সবচেয়ে বড়ো বিপদ ছিল এটাই, দাঙ্গাবাজরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল—যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মদিনা আস্থাভাজন কোনো খলিফা বাছাই করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাস কায়েম করবে। এহেন পরিস্থিতিতে শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দ গিয়ে মসজিদে সমবেত হন এবং আলি (রা.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

এমন একটা সময়ে উম্মাহ আলি (রা.)-এর কাছে এসে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছে, যখন পরবর্তী খলিফার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষামান এতৎসত্ত্বেও রাজি হলেন আলি (রা.)। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনসম্মুখে দেওয়া প্রথম ভাষণে তিনি বললেন, অনেকটা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই তাঁকে এই দায়িত্বটা কাঁধে নিতে হয়েছে। তিনি সেই ভাষণে দুঃখ করে বলেন—'রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করার পর প্রথম প্রজন্ম অতীত হওয়ার আগেই উম্মাহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল!' তাই উম্মাহকে শৃঙ্খলার ভেতরে আনতে হলে তাঁকে অনেক কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি উম্মাহকে সতর্ক করে জানান, তারা যেন তাঁর কাছ থেকে কঠোরতা ছাড়া আর কিছুই আশা না করে।

তবে মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ খলিফা আলি (রা.)-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা দামেশকের গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। এই দলে উমাইয়া বংশের সন্তানদের আধিক্যই ছিল বেশি। কারণ, উসমান (রা.) ছিলেন উমাইয়া বংশের। তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) নতুন খলিফার কাছে দাবি জানান, যেন তিনি খলিফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের আটক করে শাস্তি দেন, নতুবা পদত্যাগ করেন।

কিন্তু আলি (রা.) কীভাবে উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীকে গ্রেফতার করবেন? কেউ আসলে জানত না বা চিনত না যে, উত্তেজিত দাঙ্গাবাজদের মধ্যে কে উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। মূলত সেই দাঙ্গাবাজদের সকলেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। মুয়াবিয়া (রা)-এর দাবি পূরণ করতে হলে আলি (রা.)-কে গোটা দাঙ্গাবাজদের সবাইকেই আটক করতে হতো, যা ওই

পরিস্থিতে কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল না। দাঙ্গাবাজরা তখনও মদিনার রাস্তায় বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তাই বাস্তবিক কারণেই মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবিগুলো পূরণ করা খলিফা আলি (রা.)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এমতাবস্থায় খলিফা আলি (রা.) সাম্রাজ্যের মূল সংকট সমূলে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সফল হন বা না হন, এটাই ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। খলিফা আলি (রা.) উসমান (রা.)-এর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালালেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি উসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সকল গভর্নরকে বরখাস্ত করে নতুন করে গভর্নর নিয়োগ করলেন; যদিও ইয়েমেনের একজন গভর্নর ছাড়া আর কোনো গভর্নরই পদ ছাড়তে রাজি হলো না।

এরই মধ্যে নতুন করে আরেক সংকটের সৃষ্টি হলো। নবিজির স্ত্রী আয়িশা (রা.) খলিফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আলি (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আয়িশা (রা.) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা সক্রিয় হলেন। তিনি মক্কায় এক জ্বালাময়ী ভাষণে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'হে মানুষ! বিদ্রোহীরা নিষ্পাপ উসমানকে হত্যা করেছে। তারা নবির শহরের পবিত্রতা এবং হজের মাসের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। তারা মদিনার নাগরিকদের সম্পত্তি লুটপাট করেছে। আল্লাহর কসম! যারা হত্যা করেছে, তাদের সবার জীবনের চেয়েও উসমানের একটি আঙুলের মর্যাদা অনেক বেশি। যারা অন্যায় করেছে, তাদের এখনও ধ্বংস করা হয়নি, আইনের আওতায় আনা হয়নি। কিন্তু উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমেই ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।'

তাঁর এই ভাষণ শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। এভাবেই ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ মতপার্থক্যপূর্ণ এক মহাসংকটকালের দিকে এগিয়ে গেল। স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল মুসলিম উম্মাহ। একপক্ষ নতুন খলিফা আলি (রা.)-এর আনুগত্যের অধীন, আরেক পক্ষ তাঁর বিরোধী। দ্বিতীয় পক্ষে দুটি দল। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল, অন্যদিকে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর নেতৃত্বে আরেক দল।

এমন পরিস্থিতে মুসলিম উম্মাহ পড়ে গেল সংশয় ও দ্বিধায়। এই সুযোগে সরব হলো মুনাফিক সম্প্রদায়। তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও পদক্ষেপের মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দূরত্ব বাড়াতে থাকল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দূরত্ব গড়াল যুদ্ধে। আয়িশা (রা.) একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বসরার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সাথে যোগ দিলেন তালহা ও জুবায়ের (রা.)-এর মতো রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিরাও।

আলি (রা.)-ও সৈন্য প্রস্তুত করে মদিনা থেকে বের হলেন। শুরুতে তাঁর হাতে খুব বেশি সৈন্য ছিল না। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই অনেকগুলো গোত্রের লোক এসে তাঁর বাহিনীতে যোগদান করার ফলে বাহিনীর আকারও বেশ বৃদ্ধি পায়। যখন এই সেনাদল নিয়ে আলি (রা.) বসরায় পৌঁছালেন, তিনি তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর কাছে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। সেই সমঝোতাকারী আয়িশা (রা.)-কে বেশ শান্ত করতে সক্ষম হলেন। প্রথমত, আয়িশা (রা.) ওই সেনাপতির কাছে স্বীকার করেন, তিনি মনে করেন না যে উসমান (রা.) হত্যায়

আলি (রা.)-এর আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু আলি (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর অভিযোগ হলো—আলি (রা.) খলিফার দায়িত্ব নিয়েও উসমান (রা.)-এর খুনিদের ধরতে পারেননি। আয়িশা (রা.) এরপর এটাও স্বীকার করলেন, উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কি না, তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না; বরং একধরনের অস্থিরতার থেকেই এই খুনি-দাঙ্গাবাজদের জন্ম হয়েছে। তিনি এও স্বীকার করেন, আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তিনি এই নৈরাজ্যকেই বৃদ্ধি করছেন এবং এর ফলে উসমান (রা.)-এর খুনিরা বেঁচে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পারে। সবশেষে তিনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলে তাঁর সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ব্যাপারেও একমত এবং আলি (রা.)-এর সাথে যোগ দিতেও রাজি হন। আয়িশা (রা.) জানান, তিনি পরের দিন আলি (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে সমঝোতার ধরন ও প্রক্রিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলাপ করবেন।

এই সমঝোতার কৃতিত্ব উভয়পক্ষের। আলি (রা.) তাঁর দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন সমঝোতার বার্তা পাঠিয়ে। আর আয়িশা (রা.)-এর কৃতিত্ব হলো—তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সততা দেখিয়েছেন; এমনকি যুদ্ধের দামামার মাঝে থেকেও নিজের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।

সমঝোতার এই খবর উভয় শিবিরেই উৎসব ছড়িয়ে দিলো। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যে, মুসলিমদের আর নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হচ্ছে না। কিন্তু এই ফাঁকে উভয় শিবিরেই উসমান (রা.)-কে হত্যাকারী সেই দাঙ্গাবাজদের অনেকেই ঢুকে পড়ে। তারা এই ধরনের সমঝোতাকে কখনোই মেনে নেয়নি। কারণ তারা জানত, যদি আলি ও আয়িশা (রা.)-এর মধ্যেকার বিরোধ মিটে যায়, যদি তাঁরা এক হয়ে যায়, তাহলে তারা ধরা পড়ে যাবে। ফলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে আইনের আওতায় এনে। তারা কোনোভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ দিতে রাজি ছিল না।

পরের দিন ভোরে এই ধরনের মতাবলম্বী দাঙ্গাবাজদের একটি দল আলি (রা.)-এর শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গিয়ে আয়িশা (রা.)-এর ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আলি (রা.) ঘুম থেকে উঠে দেখে, আয়িশা (রা.)-এর সৈন্যরাও ফিরতি আক্রমণ করছে। আয়িশা ও আলি (রা.) উভয়ই মনে করে বসলেন যে, অপর পক্ষ সমঝোতার পথ বাদ দিয়ে এই হামলা শুরু করেছে। এভাবেই শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক যুদ্ধ, যা জঙ্গে জামাল বা 'উটের যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। আয়িশা (রা.) উটের ওপর চড়ে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে এই নামকরণ।

যুদ্ধের একপর্যায়ে উম্মুল মুমিনিনের উটটি ধরাশায়ী হয় এবং তিনি পড়ে যান। এখানেই নির্ধারিত হয় যুদ্ধের ফলাফল। আলি (রা.) যুদ্ধে জিতে যান; কিন্তু নেই কোনো বিজয়ের উল্লাস! মুসলিম জাতির জন্য কী ভয়াবহ সেই দিন! এই বেদনাবিধুর লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন অসংখ্য মুসলমান, যাদের অনেকেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি। আর নেতৃত্বে ছিলেন একদিকে রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, অপরদিকে রাসূল (সা.)-এর জামাতা।

এই লড়াইয়ের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চেষ্টা করলেন। এরই মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে, যা তাঁরা কোনো দিনও চাননি। পরবর্তী

সময়ে তাঁরা আর কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি। উটের যুদ্ধের পর আয়িশা (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন এবং জীবনের বাকিটা সময় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর হাদিস লেখা ও তা সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করেন।

আলি (রা.) আর মদিনায় ফিরে যাননি। তিনি কুফাকে (আধুনিক ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর) তাঁর শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছিল বলে তিনি তাদের পুরস্কার দেওয়ার অংশ হিসেবেই সেখানে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

ইতোমধ্যে মুয়াবিয়া (রা.) আলি (রা.)-এর আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে ও নিজেকেই খিলাফতের যোগ্যতম দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে অবধারিত হয়ে পড়ে আরেকটি গৃহযুদ্ধ। উভয়পক্ষই সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হন। ৩৭ হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হয় মুয়াবিয়া (রা.)-এর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আলি (রা.)-এর সৈন্যদের পানি সরবরাহ বন্ধ কারার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই আলি (রা.)-এর সৈন্যরা নদীর তীরদেশ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। চার দিন ধরে চলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এতে নিহত হন অসংখ্য মুসলিম!

এরপর ফয়সালা হয়, উভয়পক্ষের সৈন্যরা আর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না; বরং দুই পক্ষের দুই নেতা সম্মুখসমরে লড়াই করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। আলি (রা.)-এর বয়স তখন আটান্ন বছর। তথাপি তিনি ইতিবাচকভাবেই এই সম্মুখ লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) শেষ পর্যন্ত আর এভাবে লড়াইয়ে রাজি হলেন না।

আলি (রা.)-এর সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করল। এবার মুয়াবিয়া (রা.) আর তাঁর সৈন্যরা খুব সহজেই পরাজিত হয়ে গেল। তিনি তখন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ও তাঁর সৈন্যরা নিজ নিজ বর্শার মাথায় কুরআনের পাতাকে বিদ্ধ করে এগোতে লাগলেন, আর সামনে রাখলেন বেশ কিছু ক্বারিকে—যারা অবিরাম কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছিল। এ রকম একটি পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই কুরআনের স্বার্থে হলেও আলি (রা.) তাদের সাথে সমঝোতা করতে রাজি হন। কুরআনের এমন ব্যবহারে আলি (রা.)-এর সৈন্যরাও হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং আলি (রা.) সমঝোতা করতে রাজি হন।

আলি (রা.) শুরু থেকেই সমঝোতা করার পক্ষে ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) একজন সম্মানিত সাহাবি ছিলেন। কাতেবে ওহি হিসেবে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নেতৃত্বের গুণ নিয়েও তেমন বিতর্ক ছিল না। আলোচনার মাধ্যমে আলি (রা.)-এর খিলাফতের অধীনে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার জন্য মুয়াবিয়া (রা.)-কে নিশ্চিতভাবে রাজি করানো যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু যখন উভয়পক্ষের সমঝোতাকারীরা একসঙ্গে আলোচনার জন্য বসলেন, দুই পক্ষের সমঝোতাকারীরা একমত হয়ে জানালেন, তারা উভয়ই সমান আর সেই কারণেই তারা পূর্বের মতোই নিজেদের এলাকায় শাসন অব্যাহত রাখবে; মুয়াবিয়া (রা.) শাসন করবেন সিরিয়া ও মিশর আর বাকি পুরো খিলাফতটি শাসন করবেন আলি (রা.)।

আলি (রা.) এমনটি প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আলি (রা.) এই সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিলেন না। এই সমঝোতা তাঁর পক্ষাবলম্বী খারেজিদের ভীষণ রকম উত্তেজিত করে তোলে। খারেজি গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল এই বিতর্ক থেকেই।

খারেজি গোষ্ঠীটি আলি (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে থেকে হলেও পরে তারা আলি (রা.)-এর প্রভাববলয় থেকেও বেরিয়ে যায়। তারা নতুন একটি বিদ্রোহী চিন্তাধারার সূচনা করে। তাদের নতুন তত্ত্ব হলো : ‘রক্ত ও বংশতত্ত্ব বলে ইসলামে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই; এমনকি একজন ক্রীতদাসও উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার যে বিশেষ গুণটি লাগবে, তা হলো—উত্তম চরিত্র। কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জন্ম নেয় না। আবার কেবল একটি নির্বাচন প্রক্রিয়াই একজন মানুষকে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে তোলে না। শুধু সেই ব্যক্তি খলিফা হওয়ার জন্য যোগ্য, যার মুসলিম চেতনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিমাণ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা দৃশ্যমান থাকে। তাকে খলিফা বানানোর জন্য কোনো নির্বাচন প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাও থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি খলিফা হওয়ার পর চরিত্রের দিক থেকে আর মান ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে তিনি তার দায়িত্বের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন।’

তবে ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় একজন খলিফা পদে আসীন কিংবা অপসারিত হবেন, তার প্রক্রিয়া নিয়ে খারেজিরা অবশ্য সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকুই অনুধাবন করেছিল, আলি (রা.) খলিফা হিসেবে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই তাঁর পদ ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু তিনি পদত্যাগ করেননি, তাই তাঁকে সরানোর দায়িত্ব একজন তরুণ খারেজি নিজের হাতে তুলে নেয়। ৪০ হিজরিতে সেই বিপদগামী তরুণটি আলি (রা.)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আলি (রা.)-এর শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।[৬]

---

৬ অনুবাদ : *ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : তামিম আল আনসারি*